দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

[অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থ সামাজিক খাতে প্রায় ২০ শতাংশ হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৬.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2015 অনুযায়ী ২০১৪ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩তম।]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিহার্য। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, Human Development Report, 2015 অনুযায়ী ২০১৪ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম যা ২০১২ সালে ছিল ১৪৩তম। বর্তমানে মানব উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচকসমূহের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (০.৭৫৭), ভারত (০.৬০৯) এবং ভূটান (০.৬০৫) বাংলাদেশ (০.৫৭০) অপেক্ষা এগিয়ে আছে। অপরদিকে, নেপাল (০.৫৪৮) এবং পাকিস্তান (০.৫৩৮) এর অবস্থান বাংলাদেশ অপেক্ষা নিচে। বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়নে অগ্রগতি সময় সাপেক্ষ, তবে সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হলো যে, নিরবচ্ছিন্ন অগ্রাধিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গত তিন দশকে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.১ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	১৯৯০	২০০০	২০০৫	২০০৮	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
সূচকের মান	০.৩৮২	০.৪৫৩	০.৪৯৪	০.৫১৫	০.৫৩৯	০.৫৪৯	০.৫৫৪	০.৫৫৮	০.৫৭০

উৎসঃ Human Development Report, 2015. UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসেবে সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ কারণেই সরকার বাজেট বরাদ্দের প্রায় ২০ শতাংশ হারে অর্থ আর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেখচিত্র ১২.১ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

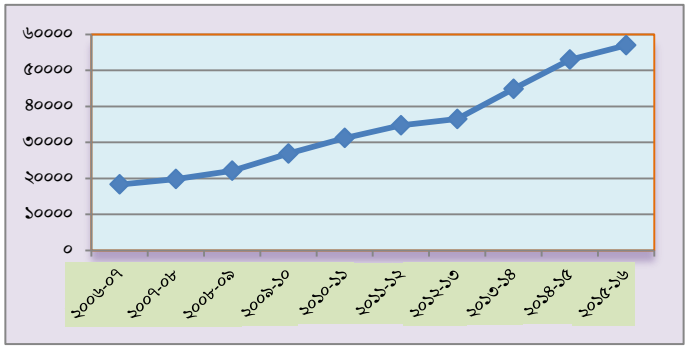

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.২-এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.২ঃ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২

মন্ত্রণালয়	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**১৮৩২৯**	**১৯৮১৮**	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। *তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিজ্ঞানমনস্ক জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

বর্তমান সরকার দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪,০৮৮.৪০ কোটি টাকা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)-সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,২২,১৭৬টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ঃ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.২ ঃ ৫০.৮-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৫ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)	৮৭.২
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)	৯০.৯
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)	৯১.১
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)	৯০.৮
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)	৯৩.৯
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫	৮৫.৬৩	৯৪.৮

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	নীট ভর্তির হার (%)
		(৪৯.৫০)	(৫০.৫০)	
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)	৯৪.৯
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)	৯৬.৭
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)	৯৭.৩
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯ (৪৯.৩০)	৯৯.১৪ (৫০.৭০)	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯ (৪৯.১৪)	৯৬.৯৯ (৫০.৮৬)	৯৭.৯

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাকাল সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকার কর্তৃক বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। ২০০৭-২০১৫ পর্যন্ত বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ১২.৪ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৪ঃ বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বৎসর	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
মোট ঝরে পড়ার হার (%)	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪

উৎসঃ Annual Primary School Census, 2015, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সারণি ১২.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭ সালে মোট ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২০.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা (contact hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৬.৪:৩৩.৬ ।
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল, কার্যকর ও কর্মমুখী করার প্রয়াসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি অনুমোদন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে “ইংলিশ ইন এ্যকশান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছিল। জুলাই ২০১৫ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত এবং নতুন ভাবে উন্নীত ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীসহ ১.৩০ কোটি সুবিধাভোগীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৩টি উপজেলার ৩৩.৯৫ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে এবং এ পর্যন্ত ৬৬৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সালে ''বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১০'' আয়োজন করা হয়েছে। ২০১১ সাল হতে ছাত্রীদের জন্য ''বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'' আয়োজিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর এ আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক অবকাঠমোগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে, ৪১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে, পিইডিপি-৩ এর আওতায় ১৫টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ২,০৫৫টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২১৮টি বিদ্যালয় মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও ৬,০৯৬টি গভীর/তারা নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, ৪,২১৩টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে এবং ১১টির নির্মাণকাজ সমাপ্তির পথে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ১,০৮৬ টি বিদ্যালয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৫০টি বিদ্যালয় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও ১৩৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। আইডিবি এর সহায়তায় নির্মিতব্য ১৭০টি বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে ৪৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট সকল বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৮.৩৯ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৮.৫২ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৬৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.১৩ শতাংশ। বিগত সময়ের মতো পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা উন্নীত করে প্রায় ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৪৯.৫ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসেবে নিয়োজিত রাখেন। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বহু শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫,৬৮৭.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.৭০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

সরকার প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণিতে শতভাগ নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ এবং ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১১ কোটি ২০ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে শতভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি

পূর্বে ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য বাৎসরিক সংযোগ সময় ৫৯৫ ঘন্টা এবং ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য ৮৩৩ ঘন্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ৪ হাজার দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রুপান্তরিত করার ফলে এক শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণিতে ৯২০ ঘন্টা এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় ১,২৩০ ঘন্টা দাঁড়িয়েছে। দুই শিফটের বিদ্যালয়ে ১ম-২য় শ্রেণি এবং ৩য়-৫ম শ্রেণির বেলায় সংযোগ ঘন্টা যথাক্রমে ৬০০ ঘন্টা এবং ৮১০ ঘন্টা।

শিক্ষক নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৬৬.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রথম পর্যায়ে ১৫,০০০ জন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৭,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তৃতীয় পর্যায়ে আরো ১৫,০০০ সহকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও প্রায় ১০,০০০ সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ সকল বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,১৪০.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬১ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ শিশু ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিশুদেরকে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ৮০ টাকা হারে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাথাপিছু ১০০ টাকা হারে শিক্ষা সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম এর জন্য বছরে ৪০০ টাকা, ১ম থেকে ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ বাবদ প্রতিবছর যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তিকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

হতে ভর্তি সনদ প্রদর্শন সাপেক্ষে ২,০০০ টাকা সহায়তা পাচ্ছে। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ৩ লক্ষ ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভুত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে, যা ২০১৭ সালে মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সেকেন্ড চান্স বিভাগ সৃষ্টি করা হবে। শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলছে। দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর এবং দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে ৭ টি বিভাগের আওতায় ৬৪ টি জেলার ২৫০ টি উপজেলায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে "মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর কিশোর ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রেখে প্রকল্পটি সংশোধনের কার্যক্রম চলছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানবতার বিকাশ ও জনমুখী উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি প্রদান ও এককালীন বরাদ্দ প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষার সকল স্তরে সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (performance based continuous evaluation), শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন ও অন-লাইন কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে ২৩,৬৬৯ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৩৩,৮০৪৮ জন শিক্ষক এবং ১,২৬,৬৬,৭৪৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সমগ্র বাংলাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৩৭৩ টি পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অনলাইন পদ্ধতিতে তথ্য বিনিময় চালু করা হয়েছে এবং এমপিও পদ্ধতির জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের অনলাইনে এমপিও কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য Secondary Education Sector Investment Program (SESIP) এর আওতায় ১,১৩৯ জন কর্মচারিকে মাঠপর্যায়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। Secondary Education Quality & Access Enhancement Project (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার লক্ষ্যে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৯,৬১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ১,০৪৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ৮৬,৭১০ জন শিক্ষার্থীকে ইনসেনটিভ এওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৫০ টি টিউবওয়েল, ১১১ টি ওয়াটার পাম্প ও ট্যাঙ্ক, ২০০ টি লো কষ্ট ওয়াশ ব্লক, সোলার ওয়াটার ২০০ টি এবং ২০১ টি শ্রেণি কক্ষ সংস্কার করা হয়েছে। দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে খুঁজে বের করার জন্য সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আওতায় ২০১৫ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় বর্ষসেরা ১২ জন কে নির্বাচন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির চাপ হ্রাস এবং মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪ টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় সকল ক্ষেত্রে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরী বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৭,৫০৬ টি যার মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৪৪০ টি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৭,০৬৬ টি। এছাড়া, কারিগরি সাব সেক্টরে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে এবং বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ২৩ টি বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিZটিউট নির্মাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল (টিএস) স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ২য় পর্যায়ে ৩৮৯ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল (টিএস) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্স (BITTTR) স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে সরকার বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের পুরাতন প্রায় সবগুলো জেলাতেই সরকার কর্তৃক একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ এ উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য সরকার নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে স্থাপিত নতুন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, দেশে মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে সরকার Cross Border Higher Education (CBHE)-2014 আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাংলাদেশে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement (HEQEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' এ রূপান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবস্থাপনা স্বরুপ Higher Education Management Information System (HEMIS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হেমিস পোর্টালের (ugc-hemis.gov.bd) মাধ্যমে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডাটা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে হেমিস এ ৯৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ডাটা প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালের ডাটা শীঘ্রই সন্নিবেশিত হবে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) এর অর্থায়নে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) এর কার্যক্রম শুরূ হয়েছে। বর্তমানে ইউডিএল এর সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১। সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়য়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল এর মাধ্যমে ২৭০০০ ই- বুকস ও ৩০০০ ই –জার্নাল এর এক্সেস সুবিধা পাচ্ছেন। ইউএল এর ওয়েব পোর্টাল (udl-ugc.gov.bd) এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারকারিগণ সরাসরি ই-রিসোর্স প্রোভাইডারদের পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার কামিল ও ফাজিল স্তরে একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ পাশ হয়েছে । উক্ত আইনের অধীনে ইতোমধ্যে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ও হাদিস শরীফ বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত সাধারণ আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে এনসিটিবি কর্তৃক উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসৃত হচ্ছে। সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি'র মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি ও ইসলামী বিষয়সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরমপূরণের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারি কলেজে আইসিটি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা এবং শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক ২৫৫টি প্রভাষক পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। "আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ২৩,৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয় ১৩,৬৬৪টি, কলেজ ২৪৭৫টি, স্কুল এ্যান্ড কলেজ ৬৮৬টি, মাদ্রাসা ৬,৫০৬টি প্রতিষ্ঠান) মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ২৩,৮৩৮ জনকে (শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীগণ) ১২

দিনব্যাপী Digital Content Development বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের প্রেরণ করা হচ্ছে।

সরকার আইসিটি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। "Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪,০০০ জন আইটি প্রফেশনাল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। FTFL (Fast Track Future Leader) তৈরির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০,০০০ জন আইটি গ্রাজুয়েটকে IT Top Up এবং ২০,০০০ জনকে Foundation ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে এবং e-Governance প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩,০০০ সরকারি কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৫ সালে ৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৫৫,০০০ ফ্রি-ল্যান্সারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২০,০০০ জন মহিলাকে Basic ICT literacy'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে আরো ২৫,০০০ যুবক/যুবতীকে Basic ICT Training এবং ১০,০০০ জন সাইন্স গ্রাজুয়েট কে Advanced outsourcing'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ কোটা হতে ২০ শতাংশ কোটায় উন্নীত করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

স্বাস্থ্য জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং সরকার সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুনগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল-ও বেড়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫ঃ স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.২	১৯.২	১৮.৯	১৯.০	১৮.৯
	শহর	১৭.১	১৭.৪	১৭.১	১৮.২	১৭.২
	গ্রাম	২০.১	২০.২	২০.০	১৯.৩	১৯.৪
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৬	৫.৫	৫.৩	৫.৩	৫.২
	শহর	৪.৯	৪.৮	৪.৬	৪.৬	৪.১
	গ্রাম	৫.৯	৫.৮	৫.৭	৫.৬	৫.৬
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৩.৯	২৩.৯	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৯
	নারী	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৭	১৮.৪	১৮.৩
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		২৭৮৫	২৮৬০	২৮৬০	২৮৬০	২১২৯
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৭.৭	৬৯.০	৬৯.৪	৭০.৪	৭০.৭
	পুরুষ	৬৬.৬	৬৭.৯	৬৮.২	৬৮.৮	৬৯.১
	মহিলা	৬৮.৮	৭০.৩	৭০.৭	৭১.২	৭১.৬
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, <১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৩৬	৩৫	৩৩	৩১	৩০
	শহর	৩৫	৩২	৩১	২৬	২৬
	গ্রাম	৩৭	৩৬	৩৪	৩৪	৩১
শিশূ মৃত্যু হার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪৭	৪৪	৪২	৪১	৩৮
	শহর	৪৪	৩৯	৩৭	৩৫	৩০
	গ্রাম	৪৮	৪৭	৪৪	৪৩	৪০
মাতৃ মৃত্যু হার (%)	জাতীয়	১.৯৪	২.০৯	২.০৩	১.৯৭	১.৯৩
	শহর	১.৭৮	১.৯৬	১.৯০	১.৪৬	১.৮২
	গ্রাম	২.৩০	২.১৫	২.১০	২.১১	১.৯৬
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৬.৭	৫৮.৩	৬২.২	৬২.৪	৬২.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.১২	২.১১	২.১২	২.১১	২.১১

উৎসঃ Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2014

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

জাতীয় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে মোট ৫১,০৮২.৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)" শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

কমিউনিটি ক্লিনিক

একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০ টি চালু করা হয়। কিন্তু ২০০১-২০০৮ মেয়াদে

কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবাদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ২০০৯ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি (২০০৯-১৪) 'Revitalization of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১৩,১৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারী হিসেবে ১৩,৮৩৯ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চালু কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৬৬৬ কোটি টাকার ৩০ প্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়েছে। ১০৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী রুম নির্মাণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১০৩৭ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার-কে CSBA প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষিত জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সারাদেশে ১,০০০ এর অধিক কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ পর্যন্ত ২৩ হাজারের অধিক নিরাপদ প্রসব পরিচালিত হয়েছে। এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট মডেম প্রদান হয়েছে। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে অনলাইনে রিপোর্টিং হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যতম অবদান হচ্ছে প্রসূতি সেবা যে কারণে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ব্যাপকভাবে কমেছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসুচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশে ডেঙ্গু, সোয়াইন ফ্লু এবং সার্স রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষারোগ নির্ণয়ের হার শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৬ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া Child Health Programme, School Health Programme, Adoloscent Health Programme, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার HPNSDP কর্মসূচির মাধ্যমে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত রাখার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি দেশব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি উদযাপিত হয় যার আওতায় প্রায় পাঁচ কোটি বিশ লাখ শিশুকে (৬ মাস থেকে ১৫ বছরের নিচে) হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশব্যাপী ২ কোটি ২০ লাখের অধিক শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ (EPI Coverage Evaluation Survey 2014) এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য সারণি ১২.৬ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১২.৬ঃ ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (%)	ওপিডি-১ (%)	ওপিডি-২ (%)	ওপিডি-৩ (%)	পেন্টা-১ (%)	পেন্টা-২ (%)	পেন্টা-৩ (%)	হাম (%)	সকল টিকা (%)
২০১১	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১২	৯৯	৯৯	৯৭.৭	৯৫.১	৯৯	৯৭.৬	৯০	৮৮.৫	৮২.৯
২০১৩	৯৫	৯৫	৯৪	৯২	৯১	৯৩	৯২	৮৬	৮১
২০১৪	৯৯.২	৯৫.১	৯৪.২	৯৪	৯১	৯৩	৯৩	৮৬.৬	৮১.৬ (< ১ বছরের শিশু) ৯২ (< ২ বছরের শিশু)

উৎসঃ Bangladesh EPI CES ২০১১,২০১২, ২০১৩ ,২০১৪

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

জাতীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবিএদের প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এর প্রবর্তন, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এর আগাম সনাক্তকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারা দেশে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলায় সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় ব্যাপক আকারে মাতৃ, শিশু ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (MNCH) বাস্তবায়ন করছে। জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায় দেশের প্রতিটি জেলায় Emergency Obstretic Care (EmOC) চালু করেছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯ জেলা হাসপাতাল, ৩ সাধারণ হাসপাতাল, ১৩২ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬৩ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে Comprehensive Emergency Obstretic Care (CEmOC) এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Basic Emergency Obstretic Care (BEOC) সেবা চালু আছে। EmOC সেবা সম্প্রসারণের ফলে মাতৃমৃত্যুর হার মোট প্রসবের ০.১৭ শতাংশ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার মোট জীবিত জন্মের ২.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নে Obstretric Fistula সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে। Bangladesh National Strategy for Maternal Health চূড়ান্ত করা হয়েছে। National Menstruation Regulation Services Guideline অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত চলতি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP) এর আওতায় ২০১১-২০১৬ মেয়াদে "ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)" শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসুচির মূল লক্ষ্য হলোঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, কর্মচারীদের সহায়তায় অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুষ্টি সেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার কমানো।

দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Severe Acute Malnutrition (SAM) ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪৮৭ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এর সাথে সমন্বিতভাবে পুষ্টি কর্ণার চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ৪২৪টি শিশুবান্ধব ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এনএনএস শহরের বস্তি এবং গ্রামের দূর্গম এলাকাসহ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় পুষ্টি নীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় খাদ্য প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। অপুষ্টির ঘাটতি ও নিরাময় কৌশল মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। ৬৪টি জেলায় পুষ্টিবিদের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ -এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৭ঃ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০০৭	২০১১	২০১৪
কম ওজনের শিশু (%)	৪১	৩৬	৩৩
খর্বাকৃতি শিশু(%)	৪৩	৪১	৩৬
শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের হার(%)	৪৩	৬৪	৫৫
ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার (৬-৫৯ মাস)	৮৮	৬০	৬২

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য বীমা

স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩২ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage-UHC) অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশল (২০১২-৩২) প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাংগাইল জেলার তিনটি উপজেলায় "স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)" নামে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠিকে একটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাবে। এছাড়া, জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অন্যতম একটি কর্মকৌশল হলো দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রেণীর জনগণকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির আওতায় আনা। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা চালুর মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন ২০১৫ (Health Protection Act 2015) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য খাতে তথ্য-প্রযুক্তির সফল ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মীদের ল্যাপটপ এবং এন্ড্রয়েড ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রি উন্নত করে নাগরিকদের স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরণী তৈরি করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর আওতায় প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন 'Health Identifier Code' প্রদান করা হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটা বেজ এর সাথে সংযুক্ত হবে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি কার্যক্রম, স্বাস্থ্য খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ডাক্তারদের ছুটি ও ডেপুটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সকল ধরণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা হয়েছে। মেশিনে আঙ্গুলের ছাপ এর মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৮০০ সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ প্রদান বা স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ৪৩টি হাসপাতাল থেকে উন্নত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে নাগরিকদের অনলাইনে অভিযোগ/মতামত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে একটি সার্বক্ষণিক কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আওতায় আনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা

অধিদপ্তরাধীন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান MCHTI (Maternal Child Health Training Institute) এর Automation কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বাংলাদেশের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার কম হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। মোট প্রজনন হার (TFR) ২.৭ থেকে ২.৩-তে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বেড়েছে। এই সাফল্য অব্যাহত রাখার জন্য International Conference on Population and Development (ICPD) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ সরকার 'জনসংখ্যা নীতি' প্রণয়ন করেছে। ২০১৬ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মুল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬১ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশে উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহীতা বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ এবং দেরীতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে (১৯৭৫ সালে ৮% থেকে ২০১৪ সালে ৬২%)। তবে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি ব্যবহারের হার এখনও কম (৮%)। এইচপিএনএসডিপি কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা সামগ্রিকভাবে জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহার ৭২ শতাংশে উন্নীত করা। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৯টি ইউনিট এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে EOC সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অদ্যাবধি ৩২৩ জন চিকিৎসককে এক বছর মেয়াদি এবং ৬১৮ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে ৬ মাস ব্যাপী ওটি ব্যবস্থাপনা ও নার্সিং কেয়ারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১,৬৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রী বিদ্যায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার জন্য ৯,৯৬৭ জনকে পরিবার কল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের এম আর ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যা মাতৃ মৃত্যু ও অনিরাপদ গর্ভপাত কমানোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মাঠ পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ ইপিআই ও এনআইডি কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর, এমএফটিসি মোহাম্মদপুর এবং জেলা পর্যায়ে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের MCH-FP ইউনিট, ৩,২৯৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১২,৫৭৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক, এবং প্রতিমাসে সংগঠিত প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মা, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ সরবরাহ ইউনিটের দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা হয়েছে । ক্রয়/সংগ্রহ ও সরবরাহ অবস্থা ট্র্যাকিং করার জন্য Supply Chain Information Portal নামে একটি ওয়েব বেইজ সফটওয়ার স্থাপন করা হয়েছে, যা ডিজিটাল এ্যাওয়ার্ড মেলা-২০১১ তে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। এ পোর্টালের মাধ্যমে জাতীয় ও উপজেলা সমূহের মজুদের অবস্থা ও ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রমের চলমান অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। এভাবে ক্রয়/সংগ্রহ ও সরবরাহ অবস্থাকে নিয়মিত মনিটরিং করে কন্ট্রাসেপটিভ সিকিউরিটি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ১৩,৩৪১টি নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, এর মধ্যে ৯,০৬১টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ৪,২৮০টি হাসপাতাল ও ক্লিনিক। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস, পুষ্টি এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিস এন্ড ইউরোলজি (নিকডো)) কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার এর কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে ও পাঠ্যক্রম অব্যাহত আছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির আসন সংখ্যা ১১,৫৬৬ এ উন্নীত করা হয়েছে। দেশে সরকারি পর্যায়ে মোট ৩৬টি মেডিকেল কলেজ (৩,৭২৯ আসন), ৯টি ডেন্টাল কলেজ (৫৩২ আসন), ২৩টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন (২,০৯১ আসন), ৮টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (৭১৬ আসন), ১১টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি (২,৯৫১ আসন), ৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউশন (২,৬৩০ আসন) এবং ১৩টি নার্সিং কলেজ (১,২৮৫ আসন) দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজ করছে। একই সাথে বেসরকারি খাতে মোট ৬৪টি মেডিকেল কলেজ (৫,৯৫০ আসন), ২৪টি ডেন্টাল কলেজ (১,৩৫৫ আসন), ১০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউশন (১৬৯ আসন), ১৮২টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল (১২,৩৩৫ আসন), ১২২টি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি (১৪,৫০১ আসন), ৫১টি নার্সিং ইনস্টিটিউশন (১,৯৯০ আসন) এবং ২২টি নার্সিং কলেজ (৭৭৫ আসন) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিকল্প ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৯টি অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার কলেজ (১২৫ আসন) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে।

নার্সিং সেবা

দেশে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা পরিদপ্তরের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩৫,৬০৮ জন রেজিস্টার্ড নার্স আছে, তার মধ্যে ১৮,৯১৩ জন নার্স সরকারি চাকুরীতে কর্মরত। দেশে বিদ্যমান ৪৩টি সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউটের আসন সংখ্যা ১,৫৯০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫৮০ করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু রোধে মিডওয়াইফারী কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৮টি (১০টি নার্সিং কলেজ এবং ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট) নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১,৪৮৪ জন রেজিস্টার্ড নার্সকে ৬ মাস মেয়াদী সার্টিফায়েড (এ্যাডভান্সড) এবং মিডওয়াইফারী কোর্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ১,৩১২টি ইউনিয়ন সাব সেন্টারে মোট ২,৯৯৬টি মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬০০টি পদে সার্টিফাইড মিডওয়াইফদের পদায়ন করা হয়েছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের ঘাটতি পূরণের জন্য লালমনিরহাট, গাজীপুর, বান্দরবন ও কিশোরগঞ্জ জেলায় নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ চলছে। নার্সিং পেশায় মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে মুগদা এবং শেরে বাংলা নগরে ২টি নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। দেশেই দক্ষ ও মেধাবী নার্স তৈরির মাধ্যমে উন্নতমানের নার্সিং সেবা চালুকরণ এবং বিদেশ নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে নার্সিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। থাইল্যান্ড হতে ১৮০ জন নার্স মাস্টার্স এবং ১জন নার্স পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে দেশের বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। বর্তমানে ১৩ জন নার্স থাইল্যান্ডে মাস্টার্স

এবং ১৪ জন নার্স থাইল্যান্ড এবং কোরিয়ায় পিএইচডি করছেন। দেশের সরকারি/বেসরকারি ইউনিভার্সিটি হতে নার্সিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৫ শতাধিক নার্স মাস্টার্স এবং ৪০ জনের অধিক নার্স পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ ও জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০১২ সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- স্বাস্থ্য খাতের অর্থায়ন কৌশল (Health Financing Strategy) চূড়ান্ত হয়েছে।
- ন্যাশনাল ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি পলিসির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
- জাতীয় পুষ্টি নীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- হাসপাতালের যন্ত্রপাতি, ঔষধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, অফিস আসবাব ইত্যাদি সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিসটিক ম্যানেজমেন্ট সেল (PLMC) স্থাপন করা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট ওয়েব পোর্টাল তৈরি ও চালু করা হয়েছে।
- Drug Information এবং Adverse Drug Reactions Monitoring Cell স্থাপন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ড্রাগ ও ভ্যাকসিন টেষ্টিং ল্যাবরেটরী এবং ফুড কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ কে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- দূর্গম এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রন কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্যাকেজ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
- ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন । রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২ টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন ৩ টি সংস্থা 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর', 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' ও 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪ টি জেলা ও ৪২৬ টি উপজেলা এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ও ৮৪ টি উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করে আত্ম-কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা সারাদেশের বিপুল সংখ্যক শিশুর সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৬৪ টি জেলা অফিস ও ৬ টি উপজেলার অফিসের মাধ্যমে প্রতিবছর ৪২ টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় এবং এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু অংশগ্রহণের সুবিধা পায়। শিশু বিকাশের প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি কেন্দ্রে ২৫-৩০ জন (০-৫ বয়সী শিশু) করে ২,১০৯টি কেন্দ্রে Early Learning Facilities এর মাধ্যমে শিশু বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয়। এন্যাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর) প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক মূল্যবোধসমূহ সমুন্নত রেখে সুশীল সমাজ ও সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৌশলগত সুরক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং সমাজে শিশু নিপীড়ন, নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সারা দেশে নির্বাচিত ২০ টি জেলায় ৪০,০০০ শিশুর মধ্যে ২,০০০ টাকা হিসাবে ১৮ মাস ব্যাপী ক্যাশ ট্রান্সফার কার্যক্রম চালু রয়েছে । সারাদেশে ৬ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় শিশুকে সামাজিক সম্পৃক্ততাসহ শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া, শিশুশ্রম নিরসনকল্পে "জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যার মাধ্যমে ৯০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সংশ্লিষ্ট ট্রেডের আলোকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে শিশু বাজেট প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণ

দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাত শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি, ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবা দানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২,৫১,৮৯৮ জন গরীব রোগীকে ৯১টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮৮ জন। এছাড়াও পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয়ে শিশুর নিয়মিত উপস্থিতি, বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং শিশুশ্রম থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তর "চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। জানুয়ারি ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৮,৪২৮ জন পথশিশুকে Drop In Center এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে। শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা কার্যক্রমের অধীনে নির্বাচিত প্রতি শিশুকে মাসিক ২,০০০ টাকা করে ১৮ মাসের মোট ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু আইন, ২০১৩ এর ভিত্তিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭০৭ জন। সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৩,৯৫৬ জন। দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৯,৩৪৭ জন। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মচারিসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহাকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৪৬,৯০,৪৭১ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২০,১৪,১০২ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,১৭,২৪২ জন এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ১,৭৫,৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৩৩,৬০০ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। "ন্যাশনাল সার্ভিস" কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব-মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশের ১৭টি জেলার ১৭টি দরিদ্রতম উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ পর্যায়ে দেশের ৭ টি জেলার ২০ টি উপজেলায় কর্মসূচির সম্প্রসারণ কাজ চলছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮৭,৫৭৩ জন যুবক/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে মোট ৮৫,২৩৯ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৫৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বাজেট

বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে এ পর্যন্ত মোট ১,৪২,৩৬৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে ৯৯০ জনকে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৪,৫২১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৬,১২৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা এবং মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। এছাড়া, ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রতিভাবান খেলোয়ারদের পরিচর্যা ও যোগ্য প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ ১৭টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে।

দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে সারা দেশ থেকে লোক সংস্কৃতির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থাপনার সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। পাহাড়পুর বিহার, মহাস্থানগড়, কান্তজিউ'র মন্দির, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন সাইট-সমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এর ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি উল্লিখিত এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। সুনামগঞ্জ জেলায় সুনামগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে। বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। আটটি (মানিকগঞ্জ, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পাবনা, বরিশাল, খুলনা এবং রংপুর) জেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ চলছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মেরামত ও সংস্কার কাজ, ৬টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কাজ চলছে। বাংলা একাডেমির স্টাফদের জন্য ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন নির্মিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উন্নয়নের জন্য গ্যালারীসমূহের আধুনিকায়ন ও সংস্কার কাজ করা হচ্ছে। নেত্রকোণা জেলায় বিরিশিরিতে, বান্দরবানে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা, পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। পাঠসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য দেশের উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে গণগ্রন্থাগার স্থাপন এবং নির্বাচিত পুস্তকসমূহ ই-বুকে রুপান্তর করা হচ্ছে।